রফিকুল ইসলাম

রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখা

রবীন্দ্রনাথের জীবন সায়াহ্নে ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ থেকে ৩০ জুলাই ১৯৪১ সাল দেড় বছরের মধ্যে রচিত দুটি গান ও তেরটি কবিতা নিয়ে পনেরটি রচনার সংকলন শেষ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। মৃত্যুর মুখোমুখি রবীন্দ্রনাথের এই গান ও কবিতাগুলোর প্রত্যেকটির নিচে রচনার ইংরেজি তারিখ এবং সময় ও স্থানের উলেস্নখ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের নিচে সচরাচর রচনার তারিখ ও স্থান উলিস্নখিত থাকলেও সময় থাকে না কিন্তু শেষ লেখার ব্যতিক্রম যেমন, ‘সম্মুখে শান্তিপারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার’ গানটির নিচে লেখা আছে, পুনশ্চ (শান্তিনিকেতন) ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯। বেলা একটা। এই গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “রচনা ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে নবপরিকল্পিত ডাকঘর নাটকের শেষ দৃশ্যে ‘সুপ্ত’ অমলের শিয়রে ঠাকুরদার গান রূপে আছে। উলিস্নখিত নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হইতে পারে নাই। শুনা যায় কবি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, গানটি তাহার দেহত্যাগের পূর্বে যেন প্রচারিত না হয়; তাহার শ্রদ্ধাবাসরে ইহা প্রথম সাধারণ সমক্ষে গীত হয়।” কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ লেখার বিজ্ঞপ্তি (ভাদ্র ১৩৪৮)-তে লিখেছেন, ‘গানটি তাহার দেহান্তের পর গীত হয়, পূজনীয় পিতৃদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে পরলোক যাত্রার পর (২৪ শ্রাবণ ১৩৪৮) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও ৩২ শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে শান্তিনিকেতনে গীত হয়।’ দেখা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ তার মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর আগে তার মৃত্যু দিবসের গান রচনা করে গিয়েছিলেন, স্মরণীয় যে ‘সম্মুখে শান্তিপারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার’ রবীন্দ্র প্রয়াণের পর থেকে ঐতিহ্যগতভাবে ২২ শ্রাবণ তারিখে গীত হয়ে আসছে। শেষ লেখায় ওই গানটি ছাড়া অন্যান্য রচনায় মৃত্যুচিন্তা অপেক্ষা রবীন্দ্রজীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তার জন্মদিনের গানও রচনা করে গেছেন তবে মৃত্যুদিবসের গানের পরে, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসের গান ‘হে নূতন, দেখা দিক আবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ’ রচিত হয়েছিল ২৩ বৈশাখ ১৩৪৮ (৬ মে ১৯৪১) অর্থাৎ তার মৃত্যুর আগে শেষ জন্মদিন উপলক্ষে। এ গানটি প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘পঁচিশে বৈশাখ’ পূরবী (২৫ বৈশাখ ১৩২৯) কবিতাটির শেষ স্তবক পুনর্লিখিত হইয়া গানটি রচিত হয় কবির শেষ জন্মদিনের জন্য।’

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তার জন্ম ও মৃত্যুদিবসের গান নিজেই রচনা করে গেছেন তবে মৃত্যুদিবসের গান আগে, জন্মদিনের গান পরে। মৃত্যুর আগে শেষ জন্মদিনে তিনি রচনা করেন ‘হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ... চির নূতনের দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ হে নূতন।’ আর মৃত্যুদিবসের গানের বাণী, ‘সম্মুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার, তুমি হবে চিরসাথী লও লও হে ক্রোড়পাতি, অসীমের পথে চলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার।...’ খুব কম কবিই নিজের জন্ম ও মৃত্যুদিনের গান রচনা করে গেছেন। শেষ লেখা সংকলনের দ্বিতীয় রচনা, ‘রাহুর মতন মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া, পারে না কবিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত ঝড়ের কবলে, এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।...’ রচনা ৭ মে ১৯৪০। শেষ লেখার তৃতীয় সংকলন ‘ওরে পাখি, যাসনে কেন ডাকি বাণীহারা প্রভাত হয় যে বৃথা জানিস নে তুই কি তা।’ রচনা উদয়ন, (শান্তিনিকেতন) ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ বিকাল। শেষ লেখার চতুর্থ সংকলন, ‘রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে জনহীন বেলা দুপহরে।’ ‘শূন্য চৌকির পানে চাহি, সেথায় সান্ত্বনা লেশ নাহি। বুকভরা তার হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।’ ... রচনা উদয়ন (শান্তিনিকেতন) ২৬ মার্চ ১৯৪১, বিকাল। শেষ লেখার পঞ্চম সংকলন, ‘আরো একবার যদি পারি/খুঁজে দেব সে আসনখানি/যার কোলে রয়েছে বিছানো বিদেশের আদরের বাণী।’ রচনা উদয়ন (শান্তিনিকেতন) ৬ এপ্রিল ১৯৪১, দুপুর। শেষ লেখার ষষ্ঠ সংকলন একটি গান ‘ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।’ এই গানটি রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকট প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত করেছিলেন। এই গানের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি; জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়, মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।’ রচনা উদয়ন (শান্তিনিকেতন) ১ বৈশাখ ১৩৪৮।

শেষ লেখার সংকলনের সপ্তম রচনা ‘জীবনপবিত্র জানি, অভাব্য স্বরূপতার/অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে পেয়েছে প্রকাশ/কোন অলক্ষিত পথ দিয়ে সন্ধান মেলে না তার।’ রচনা উদয়ন (শান্তিনিকেতন) ২২ এপ্রিল ১৯৪১। শেষ লেখার অষ্টম সংকলন, ‘বিবাহের পঞ্চম বয়সে/যৌবনের নিবিড় পরশে/গোপন রহস্য ভরে/পরিণত রসপুঞ্জ অন্তরে অন্তরে/পুষ্পের মঞ্জুরি হতে ফলের স্তবকে/বৃন্ত হতে ত্বকে সুবর্ণ বিভায় ব্যক্ত করে।’ রচনা উদয়ন (শান্তিনিকেতন) ২৫ এপ্রিল ১৯৪১, সকাল। শেষ লেখার নবম সংকলন ‘বাণীর মূরতি গড়ি/একমনে নির্জন প্রাঙ্গণে/পি পি মাটি তার যায় ছড়াছড়ি। রচনা উদয়ন (শান্তিনিকেতন) ৩ মে ১৯৪১, সকাল। শেষ লেখার দশম সংকলনটি জন্মদিন উপলক্ষে (৮০তম) রচিত, শান্তিনিকেতনের উদয়নে, ৬ মে ১৯৪১।

আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বহুজন দ্বারা
তাহাদের হাতের পরশে

মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

এ কবিতায় কবির যে কামনা তা বারবার বিভিন্ন রচনায় ঘুরে-ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের বিদায় নেওয়ার দিন যতই ঘনিয়ে এসেছে, ততই মর্ত্যপ্রীতি এবং মানুষের ভালবাসার আকাপক্ষা উদগ্র হয়ে উঠেছে। আর একটি ব্যাপার ঘটেছে, কবি তার অতীত জীবনকে পরিমাপ করেছেন এবং তার জীবনের অভিজ্ঞতার সারাৎসার তুলে ধরেছেন। তেমনই এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, ‘রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়। রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ, চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়; সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা।’ কবিতাটির শেষ তিনটি পঙ্‌ক্তি যেন সমগ্র রবীন্দ্রজীবনের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ,

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

শান্তিনিকেতনের উদয়নে ১৩ মে ১৯৪১ রাত্রি ৩-১৫ মিনিটে রবীন্দ্রনাথের ওই অনুভূতি মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের চৈতন্যের সত্য উদ্‌ঘাটন। শেষ লেখার দ্বাদশ সংকলনে আবার জন্মদিন প্রসঙ্গ, ‘তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে/বিচিত্র সজ্জিত আর্জি এই প্রভাতের উদয় প্রাঙ্গণ। নবীনের দানসত্র কুসুমে পলস্নবে অজস্র প্রচুর।’ উদয়ন শান্তিনিকেতনে ১৩ জুলাই ১৯৪১ সকাল বেলায় রচিত। শেষ লেখার ত্রয়োদশ সংকল্প আর একটি অনন্য সৃষ্টি, ‘প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল/সত্তার নূতন আবির্ভাবে কে তুমি। মেলেনি উত্তর। বৎসর বৎসর চলে গেল, দিবসের শেষ সূর্য/শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কে তুমি। পেল না উত্তর।’ এ কবিতাটি শান্তিনিকেতনে নয়, কলকাতা জোড়াসাঁকোতে ১৯৪১ সালের ২৭ জুলাই সকালে রচিত। কবিকে চিকিৎসার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা নিয়ে আসার পর, তিনি আর শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে পারেননি। কলকাতা, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, রোগশয্যায় ১৯৪১ সালের ২৯ জুলাই তিনি রচনা করেছেন তার সমগ্র জীবনের যন্ত্রণার চিত্রকল্প, ‘দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে এসেছে আমার দ্বারে; একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তার।’

শেষ লেখার শেষ সংকলন রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখা ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাই সকাল সাড়ে নয়টায়,

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।

পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে কবির ওই যে অমোঘ উচ্চারণ তা যে কত বড় সত্য তা রবীন্দ্রনাথই জানেন।